নারী শ্রমিক : প্রসঙ্গ কৃষিক্ষেত্র

আশরোফা ইমদাদ

কারিমা আক্তার, পেশায় কৃষক। বসতভিটার সামনেই এক চিলতে জমি তার। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে এই জমিতে তরমুজ আর শাকসবজি চাষ শুরু করেন তিনি। উৎপাদিত এসব পণ্য বাজারে বিক্রি করে চলে কারিমা ও তার ছোট দুই সন্তানের সংসার। এ ছাড়াও তিনি গ্রামের একটি ধানের খোলায় ধানের কুড়া শুকানোর কাজ করেন। সেখান থেকে যা আয় হয়, তা মিলিয়ে তার সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চলে যায়। তবে, ধানের খোলায় কখনো বেশি পান, কখনো বা কম। যেদিন খোলার মালিক কোনো পুরুষ শ্রমিক পায়, সেদিন আর কারিমাকে বেশি টাকা দেন না। বলেন, পুরুষের তুলনায় কাজ কম হয়েছে। যা পায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন কারিমা। কিন্তু পুরুষের সমান কাজ করেও দিন শেষে মজুরি বৈষম্য তাকে যেন মিইয়ে দেয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি এখনও মূল চালিকা শক্তি। দেশের জনসংখ্যার বিস্তৃত অংশের খাদ্য সুরক্ষা কৃষিখাতে অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। বিশ্বজুরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রামীণ নারীরা কৃষিকাজ ও কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশেও কৃষিক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও নয়।

১৯৯৬-৯৯ এর শ্রমশক্তি জরিপে প্রথমবারের মতো কৃষিক্ষেত্রে নারীদের জড়িতকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার, ধানের কুড়া শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাদ্য সংরক্ষণের মতো কাজগুলিকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই কাজগুলি বেশিরভাগ গ্রামে নারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়াও নারীদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য কাজ রয়েছে যা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে দেখা হয় না। ২০০৫-০৬ এর শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ১৫ বছরের বেশি জনসংখ্যার ৪৮.১ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল। শ্রমশক্তির এই জরিপ অনুসারে, পুরুষদের মধ্যে ৪১.৮ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ১৮.১ শতাংশ সরাসরি কৃষিতে কাজ করছিলেন। এতে দেখা গেছে, কৃষিক্ষেত্র কেবল কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেই শুধু সবচেয়ে বড় খাত ছিলোনা, এটি নারীদের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক গতিশীলতার বৃহত্তম ক্ষেত্রও ছিল। বিগত দশকে কৃষিক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণ ১০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। এই ব্যাবধানটি নারী শ্রমিকদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমানে ৭০ শতাংশেরও বেশি নারী শ্রমিক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন, যার মধ্যে বনজ এবং মৎস্যজীবন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কৃষি খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা গত দশকে ৪.৫ মিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে। সার হিসাবে ছাই ছিটানোর ক্ষেত্রে, মাটির উপরের স্তরে বিভিন্ন জৈব পদার্থের ব্যবহার, পাহাড়ের জুম চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ফসল উৎপাদনে নারীদের অবদান ২৭ শতাংশ বলে অনুমান করা হয়। বেশিরভাগ নারীরাই চাষ সম্প্রসারণের কারণে গত দুই দশকে সবজি উৎপাদন পাঁচগুণ বেড়েছে। তারা দেশে উদ্যানচর্চা ও উদ্যান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এগুলি পরিবেশ-বান্ধব এবং বৃক্ষরোপণ, বনজ, জমি সংরক্ষণ, জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কৃষিকাজই নারীদের প্রধান পেশা। অনেক নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল, চাকমা, গারো বহু শতাব্দী ধরে কৃষি শ্রমশক্তি হিসাবে কাজ করছেন। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার ৮ ভাগ নারী। ফসল চাষ থেকে শুরু করে ফিশারিজ সব ক্ষেত্রে নারীরা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশ নেন। নারীরা বাড়ির বাগানেও প্রতি সপ্তাহে ৬-৮ ঘন্টা বা এর বেশি সময় ব্যয় করেন। সবজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি কার্যকর। ফসল কাটতে নারীরা বেশি পারদর্শী। বাড়ির বাগান করার জন্য আন্ত:সাংস্কৃতিক অপারেশনগুলি বেশিরভাগ ঘরের নারীরা পুরুষ সদস্য হিসাবে সম্পাদন করে। নারীর ক্ষমতায়নকে বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা অর্জনের জন্য একটি পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

নারীরা ভারি কৃষিতে নিযুক্ত, তবে তা প্রায় অচেনা। নারীদের অংশগ্রহণের হার কৃষিতে ১৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন সামগ্রিকভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের অংশগ্রহণ বেড়েছে ১৯৯৯ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৫৫.৯৭ ভাগ। একই সময়ে পুরুষদের অংশগ্রহণ ১৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ২০০২-০৩ সালের মধ্যে নারীরা গ্রামীণ অঞ্চলে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪৮ ঘন্টা সময় কাজে কাটাতেন এবং শহরাঞ্চলে এটি ছিল মাত্র ২৮ ঘন্টা, যদিও ২০১১-১৭ সালে উভয় অঞ্চলের জন্য এটি ৩৩ ঘন্টা। ২০১৩-১৪ সালে কৃষিতে প্রশিক্ষণের হার হ্রাস পেয়েছে প্রশিক্ষিত লোকের পুরুষদের জন্য ১১ ভাগ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৩ ভাগ ছিল এবং ২০১১-২০১৬ সালে তা হয়েছে পুরুষের জন্য ০.৮ ভাগ এবং নারীদের ০.২ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। মজুরির হার, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং বাজারে অ্যাক্সেস ইত্যাদি বিষয়গুলো কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা নারীদের কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত হতে বাধা দেয়। পিতামাতাদের কাছ থেকে নিরুৎসাহ, শ্বশুর-শাশুড়ি, সমাজ ইত্যাদি নারীদের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কৃষক হিসাবে নারীরা দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন এবং কৃষিতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য নারীরা পরিবারে তাদের সময় সীমাবদ্ধ করেন।

বিভিন্ন সূত্র মতে, নারী শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পুরুষের সমান কাজ করে এবং কৃষিতে ২১ ধরণের কাজের মধ্যে ১৭ ধরণের কাজের সাথে জড়িত, অথচ তারপরও তাদের কাজের স্বীকৃতি নেই। আসলে, নারীরা তাদের অবদান সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাদের কাজের স্বীকৃতি নিয়ে মোটেই সচেতন নয়, যদিও তারা যথাযথ প্রক্রিয়া, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কম মজুরি, মজুরি বৈষম্যসহ অন্যান্য আরো বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলেছে, বিশ্বের খামারে এখনও নারীরা উল্লেখযোগ্য বৈষম্যের মুখোমুখি হন। ফলে সংস্থানগুলিতে তাদের অ্যাক্সেস কম হয় এবং তারা ফসলের ফলনও অনেক কম পান।

নারী কৃষকদের জমির উপর মালিকানা না থাকায় তারা কৃষকদের জন্য সরকারের দেয়া সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারী কৃষকরা যদি এই সুবিধা পেত, তবে কৃষিতে তাদের অবদান আরও বেড়ে যেত। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে যে, কৃষি কাজ এমন দেশগুলিতে বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের একটি ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে যেখানে এটি দরিদ্রদের প্রধান পেশা। তবে অনেক উন্নয়নশীল দেশের কৃষিক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর হচ্ছে, কারণ কৃষিক্ষেত্র এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে নিযুক্ত নারীরা উৎপাদনশীল সম্পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে আসছে। এমনকি নারীদের নিজস্ব উপার্জনের উপর অধিকার নেই। নারী কৃষকরা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সুবিধা এবং সেচ ব্যবস্থাপনা থেকে বঞ্চিত হন। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যর্থতার কারণে তারা পিছিয়ে পড়ছে। তারা তাদের পণ্য বিক্রয় করতে সমস্যার মুখোমুখি হন।

যদিও কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান প্রচুর থাকলেও সে অর্থে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। পারিবারিক কাজ ছাড়াও, ৭৭ ভাগ গ্রামীণ নারীরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের পাশাপাশি সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃষি কাজ   
করেন। সারাদেশে ১৪ মিলিয়নেরও বেশি কৃষক কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, এগুলিতে নারীদের অংশ খুবই নগণ্য। কৃষক হিসাবে স্বীকৃতির অভাবে তারা সরকার প্রদত্ত কৃষিবীমা কভারেজ এবং অন্যান্য সুবিধাও সেভাবে পায় না।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে নারীর মর্যাদা এখনও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত নয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণা অনুসারে, বাংলাদেশি নারীরা প্রতিদিন কৃষি কাজসহ গৃহস্থালি কাজে গড়ে ১৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করেন। আর্থিকক্ষেত্রে, এই অবদানটি ৬০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য। এই পরিমাণ দেশের জিডিপিতে যুক্ত করা গেলে জিডিপির আকার বেড়ে যেত। পুরুষদের দ্বারা সম্পাদিত   
প্রায় ৯৮ শতাংশ কাজ জিডিপিতে যুক্ত করা হয়, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে মাত্র ৪৭ শতাংশ। অনেক ক্ষেত্রে, নারীরা অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাড়াতে মূল ভূমিকা পালন করেন। তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি,

পরিবারকল্যাণ, সামাজিক অধিকার, আইনি অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সুবিধাসমূহসহ সরবরাহ করা প্রয়োজন। নারী কৃষকদের প্রয়োজন অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে সকল নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারী কৃষক এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের সরাসরি জড়িত হওয়া নিশ্চিত করা দরকার।

পুষ্টি, আর্থিক লাভ এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে নারী কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশব্যাপী ‘এএনজিএল’ প্রোগ্রাম চালু করছে এবং শীঘ্রই ‘এএনজিএল’ প্রোগ্রামটি দেশব্যাপী নেওয়ার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত করার ঘোষণা দিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের কৃষিতে নারীদের জড়িত থাকার ইতিহাস রয়েছে। কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত নারীরা আমাদের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক পর্যায়ে বউ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে নারীরা অবাদে তাদের পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, তাদের পণ্য উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বাজরজাত করণের জন্য সরকার জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমান সরকার জয়িতা ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় পর্যায়ে সম্প্রসারিত করে সমগ্র দেশব্যাপী একটি নারীবান্ধব আলাদা বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর সামগ্রীক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরাম্বিত করে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ সরকারের লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি বাজারে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন নারী শ্রমিক যেন তার উৎপাদিত পন্য ন্যয্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেন তা এখন সময়ের দাবী। আর এ লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার।

-০০-

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)